কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা আমাদের জন্য বেশি উপযোগী

- সংসদীয় পদ্ধতির সূতিকাগার এবং বড় উদাহরণ হলো ইংল্যান্ডের সরকারব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একজন আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, যাঁর কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকে না।
- রাষ্ট্রপ্রধানশাসিত সরকারব্যবস্থার উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনাপদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান কার্যত একই ব্যক্তি হন।

আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি যে গণতান্ত্রিক হতে হবে, গণ-অভ্যুত্থানের পর এ নিয়ে এখন কারোরই কোনো দ্বিমত নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নানা ধরন আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য হবে?

মোটাদাগে, গণতান্ত্রিক সরকারপদ্ধতি দুই ধরনের। এক, সংসদীয় বা ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের সরকারপদ্ধতি এবং দুই, রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা পরিচালিত সরকারপদ্ধতি।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থা

ওয়েস্টমিনস্টার নামটি এসেছে লন্ডনের প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদের নাম থেকে, যা ৫০০ বছর ধরে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংসদীয় পদ্ধতির সূতিকাগার এবং বড় উদাহরণ হলো ইংল্যান্ডের সরকারব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একজন আলঙ্কারিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, যাঁর কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকে না, তিনি সাধারণত নির্বাচিত হন না, ক্ষেত্রবিশেষে বংশানুক্রমিকভাবে পদটিতে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতা থাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার হাতে।

আইনসভার সাধারণত দুটি কক্ষ থাকে। একটি বা দুটি যে সংখ্যক কক্ষই থাকুক না কেন, নিম্নকক্ষ গঠিত হয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে। আর উচ্চকক্ষ গঠিত হয় প্রধানত মনোনীত/বংশানুক্রমিক খেতাবধারী ব্যক্তিদের নিয়ে। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে, মন্ত্রী হন সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে আর দলের নেতা হন প্রধানমন্ত্রী।

অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে যেমন কোনো ফারাক থাকে না, তেমনই আবার সরকারপ্রধান আর রাষ্ট্রপ্রধান আলাদা হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসভার নিম্নকক্ষের বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়।

রাষ্ট্রপ্রধানশাসিত সরকাব্যবস্থা

রাষ্ট্রপ্রধানশাসিত সরকারব্যবস্থার উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনাপদ্ধতি। মার্কিন সংবিধান গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে এমন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটানো হয়, যেখানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, যিনি একই সঙ্গে সরকারপ্রধানও বটে।

ফরাসি আইনবিদ **মন্টেস্কুর 'ক্ষমতার পৃথককরণ তত্ত্ব'** অনুযায়ী যেভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে আইনসভা, সরকার ও বিচার বিভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সেই রকমের পৃথককরণ আছে। সেখানে সংসদ সদস্যরা মন্ত্রী বা সরকারের কোনো পদাধিকারী হতে পারেন না। একইভাবে মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য থাকতে পারেন না।

এই পদ্ধতিতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান কার্যত একই ব্যক্তি হন। তিনি নির্বাচিত হন সরাসরি জনগণের ভোটে। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্রীরা পদে থাকেন। তাঁদের দিয়েই রাষ্ট্রপ্রধান সরকার চালান। অন্যদিকে আইনসভার সদস্যরাও ছোট ছোট নির্বাচনী আসন থেকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও উচ্চকক্ষ বা সিনেটে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য দুজন করে সিনেটর নির্বাচন করতেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনপ্রণেতারা। ১৯১৩ সালে মার্কিন সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে সিনেটে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রকাঠামোতে সিনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আইনপ্রণয়ন ও বৈদেশিক চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা ছাড়াও সিনেটে শুনানি এবং অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রীদের (সেক্রেটারি) নিয়োগ করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টসহ ফেডারেল বিচারকদের নিয়োগও সিনেটে অনুমোদিত হতে হয়। রাষ্ট্রপ্রধানসহ অন্য শীর্ষ পদাধিকারীদের চূড়ান্তভাবে অভিশংসিত করার ক্ষমতাও সিনেটের। এভাবে উচ্চকক্ষ মার্কিন রাষ্ট্রকাঠামোতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে উচ্চকক্ষ বা সিনেট স্বৈরতন্ত্রের উত্থান রোধসহ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

আমাদের দেশে ১৯৭২ থেকে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সংসদীয় পদ্ধতি চললেও ১৯৭৫ সালে বাকশালের মাধ্যমে চালু হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। সামরিক-বেসামরিক শাসন মিলে সেটা বহাল থাকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। সে বছরই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে আবার চালু করা হয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার।

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারপদ্ধতি যুক্তরাজ্যের সংসদীয় পদ্ধতি থেকে কিছুটা আলাদা। এই পার্থক্য সংসদীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে। আমাদের ক্ষেত্রে সংসদ নয়, সংবিধানই সার্বভৌম।

এই ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সরকার গঠন করেন। তাঁদের নেতা একই সঙ্গে সংসদনেতা ও প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি সাধারণত অন্য সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীদের মনোনীত করেন।

সরাসরি নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হওয়া ব্যক্তিদের দ্বারাই সংসদ ও সরকার পরিচালিত হয়। অর্থাৎ সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন করেন এবং তাঁদের মধ্যকার কেউ কেউ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতারও অংশীদার হন। সংসদ সদস্যদের নেতা ও মন্ত্রীদের 'নিয়োগকর্তা' হিসেবে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী কতটা ক্ষমতাবান এবং কতটা ক্ষমতার চর্চা করতে পারেন, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসক হয়ে ওঠার জন্য যেমন তাঁর রাজনীতির দায় রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের বিদ্যমান সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতই বেশি যে এখানে ব্যক্তির ভূমিকা অনেকটাই গৌণ হয়ে যায়; যিনিই প্রধানমন্ত্রী হন, তিনিই থাকেন সব ধরনের জবাবদিহির উর্ধ্বে। এসব কিছুর উর্ধ্বে ওঠা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক মনের গড়ন এবং নানা অনুঘটকের ক্রিয়াশীলতার ওপরই অসহায়ভাবে আমাদের জনগণকে নির্ভরশীল হতে হয়। এই ব্যবস্থা কোনোভাবেই গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

গণতন্ত্রের কি কোনো বিকল্প আছে

কোন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের জন্য উপযোগী হবে, এই প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। একটা রাষ্ট্রে গণতন্ত্র আছে কি না, তা নির্ধারণ করার অনেক ধরনের মাপকাঠি আছে। আধুনিক যুগের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, কোনো দেশে গণতন্ত্র আছে কি না, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে একটা 'সাধারণ' প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে।

প্রশ্নটি হলো, **"রাষ্ট্রের একজন সাধারণ ব্যক্তির সরকারপ্রধান হওয়ার পথ কতটা সহজ বা আদৌ সম্ভব কি না"**। অর্থাৎ নিজের যোগ্যতা, শ্রম আর ক্যারিশমা দিয়ে জনগণের সমর্থন আদায় করে কোনো একদিন তিনি দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, এমন কোনো বৈধ পদ্ধতি সে দেশে আছে কি না। যদি সে রকম সুযোগ থাকে, তাহলে সেই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে।

কৃষ্ণাঙ্গ ও পূর্বপুরুষ অভিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছিলেন। এটা তিনি পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব যোগ্যতার কারণে এবং অবশ্যই দেশটির গণতান্ত্রিক কাঠামোর জোরে। অন্যদিকে রাজতন্ত্র না থাকলেও অনেক দেশেই পারিবারিক উত্তরাধিকার ছাড়া রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। নামে গণতন্ত্র না হলেও এ দেশগুলোর রাষ্ট্রকাঠামো যে গণতান্ত্রিক, তা সহজেই বোধগম্য।

১৯৮০-এর দশক থেকেই দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রধান আর ১৯৯১ সাল থেকে সংসদীয় ব্যবস্থা চালুর পর থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে 'উত্তরাধিকারের রাজনীতি'। যাঁরা এসব পদে ছিলেন, তাঁদের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে; কিন্তু উত্তরাধিকারের রাজনীতি তাঁদের অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতি চালুর সময় তৎকালীন শাসক দল বিএনপি রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতির পক্ষে ছিল। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিল বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অনড় মনোভাবের কারণে কিছুটা অনিচ্ছুক হয়েই বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতিতে রাজি হয়।

সংসদীয় পদ্ধতিতে জনগণের রায়ের চেয়েও রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, এ পদ্ধতিতে জনগণ সরাসরি একজনকে নেতা নির্বাচন করতে পারেন না। দেশকে কয়েক শ ভাগে (৩০০ সংসদীয় আসন) ভাগ করে প্রতিটি ভাগ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করেই জনগণকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাঁদের নেতা (প্রধানমন্ত্রী) নির্বাচন করেন। অর্থাৎ জনগণ ও তাঁদের নেতার মধ্যে একদল মধ্যস্থতাকারী (সংসদ সদস্য) থাকেন। এর ফলে সম্ভাব্য নেতা বা প্রধানমন্ত্রীর একটি রাজনৈতিক দল থাকতে হবে; যে দলটির আবার দেশব্যাপী সংগঠন থাকতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে ভোটে জেতার ক্ষমতা থাকতে হবে।

এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। বিশেষ কোনো পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণভাবে কারও পক্ষে অল্প সময়ে এ রকম দল গড়ে ক্ষমতায় যাওয়া বেশ দুরুহ। নানা মত-পথের মানুষকে দলে আনা, তাঁদের ধরে রাখা, তাঁদের নানাবিধ চাহিদার সমন্বয় করে দলকে বিকশিত করা সহজ কাজ নয়। এর ফলে আমাদের দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, 'রেডিমেড' ও 'বিশ্বাসযোগ্য' নেতৃত্বের জন্য দলকে উত্তরাধিকারের রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে হয়।

এর ভালো ও মন্দ - উভয় দিকই আছে। দলের জন্য ভালো হলেও জনগণের বিভিন্ন অংশের জন্য তা অস্বস্তি ও সমালোচনার কারণ হয়ে ওঠে। দল ধরে রাখতে পরিবারের ওপরই ভরসা রাখায় হরহামেশাই জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে। আবার অনেক সমালোচনা থাকলেও এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হতে পারেন পরিবারেরই কোনো রাজনৈতিক সম্ভাবনাময় সদস্য। যোগ্য হওয়ার পরও উত্তরাধিকারের রাজনীতির বদনাম বহন করে যেতে হয় তাঁকে।

এমন নানা কারণ আর অভিজ্ঞতার আলোকে নাগরিকদের সরাসরি নিজের ও দেশের নেতা নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া এবং প্রত্যেক নাগরিকের জন্যই রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে যাওয়ার অবারিত সুযোগ রাখার বন্দোবস্ত তৈরি করতে হবে। সেটা করতে চাইলে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারপদ্ধতি অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়।

আমাদের দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক চিন্তার পরিসর বর্তমানে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির চেয়ে প্রধানমন্ত্রীশাসিত পদ্ধতির দিকেই অনেকটা ঝুঁকে আছে। সংবিধান সংস্কারসহ নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতি বহাল রেখে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে কমিশনেরই করানো জনমত জরিপে আবার ৮৩ শতাংশ মানুষ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। (প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০২৫)

গণতন্ত্র মানে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় এখনো গণতন্ত্রের বিকল্প আর কিছু নেই। তাই গণতন্ত্রের বাস্তব বিকল্প হলো অধিকতর গণতন্ত্র। ভুলে গেলে চলবে না, দেশের মালিক জনগণ। জনগণের জান, মাল ও জবানের হেফাজত করতে সক্ষম হবে, এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হোক রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

আমাদের সরকারব্যবস্থাটি পাঁচশালা বন্দোবস্তের। কিন্তু আমাদের যে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, সেটা পাঁচশালা গণতান্ত্রিক বন্দোবস্তের উপযোগী নয়। এর অবশ্যম্ভাবী গন্তব্য 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো, তাতে প্রবিষ্ট মতাদর্শিক পরিকাঠামো আর রাজনৈতিক দলের গঠন—এসব একসূত্রে গাঁথা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাইলে এই কাঠামোটাকে কিছুটা হলেও বদলাতে হবে। তা না হলে দেশের ঘাড়ে জোয়ালের মতো চেপে বসা স্বৈরশাসন হটাতে প্রতি এক-দেড় দশক পরপর একটি করে গণ–অভ্যুত্থানের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

◦ **মিল্লাত হোসেন** সংবিধান, আইন, আদালতবিষয়ক লেখক ও গবেষক

ভূরাজনীতি

ইউরোপকে এখন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই চলতে হবে

চলতি মাসে ইউরোপের দেশগুলো বুঝতে পেরেছে, তাদের সবচেয়ে কাছের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ৮০ বছর ধরে যে বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতায় আগ্রহী ছিল, এখন আর তারা সে অবস্থানে নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখন মিত্রদের অবজ্ঞা করছে; ইউক্রেনকে চাপে ফেলছে এবং ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। এতে তারা ইউরোপের প্রধান সহযোগী ও ইউক্রেনের শক্তিশালী সমর্থক থেকে ধীরে ধীরে তাদের প্রতিপক্ষে পরিণত হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, তখন আসলে কেউই (এমনকি মার্কিনরাও) ঠিক জানে না, যুক্তরাষ্ট্র কী পরিকল্পনা করছে।

তবে গত সপ্তাহে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, ন্যাটোর প্রতিরক্ষা খরচ ভাগাভাগি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ ইউরোপ আর উপেক্ষা করতে পারবে না। শুধু খরচই সমস্যা নয়, যুক্তরাষ্ট্র এখন এশিয়া ও নিজের স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে ইউরোপকে এখন বড় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে যে বড় পরিবর্তন এসেছে, তা তাদের ইউক্রেন নীতিতেই স্পষ্ট। ট্রাম্প এখন যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। আগে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের দৃঢ় সমর্থক ছিল। কিন্তু এখন তারা (আমেরিকা) ইউক্রেনকে চাপ দিয়ে আলোচনায় বসাতে চাইছে এবং ইউক্রেনকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে।

বাইডেন প্রশাসন ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে, যাতে ইউক্রেনকে সাহায্য করা যায়, রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় এবং ইউক্রেনের পুনর্গঠন নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। তারা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সমন্বয় করে এই বিষয়গুলো পরিচালনা করছিল। তবে ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে, ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য এসব আলোচনায় কোনো ভূমিকা নেই। তারা আলোচনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণ দেখতে চায় না।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের মিউনিখে দেওয়া বক্তৃতা থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের ভূরাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে ইউরোপীয়রা অনেক কিছু শিখেছে। ওই বক্তৃতায় তিনি জার্মানির রাশিয়া–সমর্থক দক্ষিণপন্থী দলকে সমর্থন জানিয়েছেন। জার্মানির নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে ভ্যান্সের এই প্রকাশ্য সমর্থনদানকে দেশটির নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যদি এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সফল হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র শুধু জার্মানিকেই নয়, পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নকেই দুর্বল করে দেবে।

এ মুহূর্তে কী করা উচিত, তা নিয়ে কিছুটা সময় বিভ্রান্ত থাকার পর ইউরোপের নেতারা মহাদেশে স্থিতিশীলতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৭ ফেব্রুয়ারির অনানুষ্ঠানিক জরুরি বৈঠক ছিল তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। সেটিকেই এখন দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে।

প্যারিস বৈঠকটি হয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক সম্মেলনের (এআই অ্যাকশন সামিট) এক সপ্তাহ পর। এআই সম্মেলনে ইউরোপীয়রা প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। দুটো বৈঠক আলাদা বিষয়ের হলেও উভয় বৈঠক একই সমস্যার কথা বলছে। সেটি হলো ইউরোপকে নিজের সার্বভৌমত্ব নিজেকেই রক্ষা করতে হবে।

ইউরোপের সামনে ইউক্রেন বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে ইউরোপীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা একটি অনেক বড় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হবে। ইউরোপীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে। যদি ইউক্রেন ও রাশিয়া কোনো চুক্তিতে পৌঁছায়, তাহলে ইউরোপীয়দের দায়িত্ব হবে সেটি নিশ্চিত করা। কারণ, ইউরোপ বুঝতে পারছে, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি কমাতে চায় এবং দেশটি আর ইউরোপের কোনো বিশ্বস্ত অংশীদার নয়।

এ পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়দের ইউক্রেনের শান্তি বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার পাশে থাকা অন্যান্য এলাকা, যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়া বা বাল্টিক অঞ্চলের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।

যদি ইউক্রেন ইউরোপীয় প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অংশ হয়ে ওঠে, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে ইউরোপীয়রা অনেক ভালো থাকবে। নিজের শক্তিশালী সেনাবাহিনী, উদ্ভাবনী প্রতিরক্ষা খাত এবং সহনশীল ও সৃজনশীল জনগণকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন ইউরোপের জন্য একটি শক্তিশালী উৎস হতে পারে।

ইউরোপীয় দেশগুলোকে এখনই নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে হবে। অর্থাৎ ইউরোপে একটি নতুন নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, যাতে ন্যাটোর মধ্যে সদস্যদেশগুলো একে অপরের ওপর থেকে কিছু বোঝা ভাগ করে নিতে পারে। এমনকি যদি যুক্তরাষ্ট্র তার সহায়তা কমায় বা ন্যাটো থেকে সরে যায়, তবু ন্যাটো ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবস্থা হিসেবে থাকবে।

প্যারিসে জরুরি বৈঠকে এবং তার দুই দিন পর দ্বিতীয় বৈঠকে যেসব দেশ প্রতিনিধিত্ব করেছে, তারা পরিস্থিতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূল ভূমিকায় থাকতে পারে। ফ্রান্স, পোল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং বাল্টিক দেশগুলো (যেগুলো সবচেয়ে সরাসরি হুমকির সম্মুখীন) এর জন্য প্রস্তুত আছে বলে মনে হচ্ছে।

একইভাবে ইউক্রেনকে শক্তিশালী সমর্থন দেওয়া যুক্তরাজ্যও এর জন্য প্রস্তুত আছে। যুক্তরাজ্য ন্যাটোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পারমাণবিক শক্তি হিসেবে তার অবস্থানও রয়েছে। তাই যুক্তরাজ্যকে এই গ্রুপের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

নিরাপত্তার জন্য ন্যাটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ন্যাটো ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও তার সীমানা রক্ষা এবং দেশে উদার গণতন্ত্র রক্ষা ইস্যুতে আরও বেশি পদক্ষেপ নিতে হবে।

যদিও ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) প্রতিরক্ষা ইউনিয়নে পরিণত হবে না বা একটি ইউরোপীয় সেনাবাহিনী তৈরি করবে না, তবু এটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা সরবরাহের জন্য আরও কিছু করতে পারে। আগামী বছরগুলোতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও দেশীয় উদ্ভাবন বাড়ানো ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। যৌথ তহবিলের মাধ্যমে শেয়ার করা কৌশলগুলো ইউরোপীয়দের এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক খাতে শক্তিশালী খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হতে পারে।

ইউরোপীয়দের শক্তি আবার গড়ে তুলতে হবে। কারণ, পুরোনো জোটগুলো ভেঙে যাচ্ছে এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা ইউরোপীয়দের জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো করতে এবং চীনকে নিয়ে নিজেদের সম্পর্ক ভালোভাবে চালাতে সাহায্য করবে।

মিউনিখ স্পষ্ট করেছে, পরবর্তী যুদ্ধোত্তর আটলান্টিক সম্পর্কের দীর্ঘ যুগ শেষ। একটি শক্তিশালী পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এখন এই আশা করা খুব বড় ধরনের ভুল হবে যে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে হওয়া ক্ষতি ভবিষ্যতে সারাই করে ফেলা যাবে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, ইউরোপকে তার শক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ন্যাটোর নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে।

ইইউ, যুক্তরাজ্য ও নরওয়ের মোট জনসংখ্যা ৫০ কোটির বেশি এবং তাদের যৌথ ক্রয়ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া ঘরোয়া রাজনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও তাদের সেই প্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীলতা রয়েছে, যা এই সংকটকাল পার করার জন্য দরকার।

ইউরোপের কাছে প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে। আশার কথা, মিউনিখ দেখিয়েছে, ইউরোপ সময় নষ্ট না করে দ্রুত এগিয়ে যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

◦ **ড্যানিয়েলা শোয়ার্জার** বার্টেলসম্যান স্টিফটুং-এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য ও জার্মান ফরেন রিলেশনস কাউন্সিলের সাবেক পরিচালক